অ চি ন পা খি

ব্যোমকেশ ও আমি গত ফাল্গুন মাসে বীরেনবাবুর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে দু'দিনের জন্য কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলাম। শহরটি প্রাচীন এবং নোংরা। কলিকাতা হইতে মাত্র তিন ঘণ্টার পথ। ট্রেন বদল করিতে না হইলে আরও কম সময়ে যাওয়া যাইত।

বীরেনবাবুর সহিত আমাদের দীর্ঘকালে ঘনিষ্ঠতা। তিনি কলিকাতায় পুলিস কর্মচারী ছিলেন। বহুবার বহু সূত্রে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছি। অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি। বছর দুই আগে অবসর লইয়া এই শহরে বাস্তুভিটায় বাস করিতেছেন। কন্যার বিবাহে আমাদের সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। ব্যোমকেশেরও হাতে কাজ ছিল না। তাই বিবাহের দিন পূর্বাহ্ণে আমরা বীরেনবাবুর গৃহে অবতীর্ণ হইলাম।

বিয়ে-বাড়িতে যথাবিহিত কর্মতৎপরতা ও হৈ হৈ চলিতেছে, সানাই বাজিতেছে। বীরেনবাবু ছুটিয়া আসিয়া আমাদের সম্বর্ধনা করিলেন এবং একটি ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। ঘরের মেঝেয় ফরাস পাতা ; বরযাত্রীদের জন্য যথারীতি সাজানো। কিন্তু বর ও বরযাত্রীরা স্থানীয় ব্যক্তি, তাহারা সন্ধ্যার পর আসিবে। উপস্থিত ঘরটি খালি রহিয়াছে।

আমরা তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিলাম। চা জলখাবার আসিল। বীরেনবাবু আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে একটু উস্‌খুস্ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি কন্যাকর্তা, আজকের দিনে আপনি বসে আড্ডা মারলে চলবে কি করে ? যান, কাজকর্ম করুন গিয়ে।'

বীরেনবাবু একটু অপ্রতিভভাবে এদিক ওদিক চাহিতেছেন এমন সময় ঘরের বাহিরে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কই হে বীরেন, মেয়ের বিয়ের কি ব্যবস্থা করলে দেখতে এলাম।'

'এই যে দাদা!' বীরেনবাবু তাড়াতাড়ি গিয়া একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ঘরের মধ্যে লইয়া আসিলেন—'ভালই হল আপনি এসে পড়েছেন। এঁরা আমার দুই বন্ধু, কলকাতা থেকে এসেছেন। নাম জানেন নিশ্চয়, আমাদেরই দলের লোক। ইনি হলেন স্বনামধন্য ব্যোমকেশ বক্সী, আর উনি সুলেখক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'নাম শুনেছি বৈকি।' বলিয়া ভদ্রলোক আমাদের প্রতি তীক্ষ্ণায়ত দৃষ্টিপাত করিলেন।

বীরেনবাবু বলিলেন, 'ইনি হচ্ছেন নীলমণি মজুমদার। পুলিসের নামজাদা অফিসার ছিলেন, এখন রিটায়ার করেছেন।'

আমরাও ভদ্রলোককে দেখিলাম। গৌরবর্ণ লম্বা চেহারা ; বয়স বোধ করি ষাটের ঊর্ধ্বে কিন্তু শরীর বেশ দৃঢ় আছে ; পিঠের শিরদাঁড়া তাঁহার হাতের লাঠির মতই শক্ত এবং ঋজু। মুখ দেখিয়া মনে হয় জবরদস্ত রাশভারী লোক। গলার স্বর গম্ভীর।

ব্যোমকেশ বলিল, 'বসতে আজ্ঞা হোক।'

নীলমণি মজুমদার লাঠিসুদ্ধ হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন এবং আমাদের মুখোমুখি হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। বীরেনবাবু বলিলেন, 'নীলমণিদা, আপনারা তাহলে গল্পসল্প করুন, আমি একটু—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি প্রস্থান করুন। কেবল চাকরকে বলে দেবেন যেন তামাক দিয়ে যায়। গড়গড়া দু'টো নিষ্কর্মার মত হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে।'

বীরেনবাবু প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ নীলমণিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনারও কি আদি নিবাস এই শহরে?'

নীলমণিবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না। আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গে। কিন্তু সে-সব গেছে! রিটায়ার করে বুড়ো বয়সে কোথায় যাব, তাই এখানেই আছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখানে আপনার আত্মীয়-স্বজন আছেন বুঝি?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'আত্মীয়-স্বজন আমার কেউ নেই। বিবাহ করিনি, সারা জীবন কেবল কাজই করেছি। পুলিসের কাজে একটা মোহ আছে; আমি আমার কাজে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলাম। তারপর যখন রিটায়ার করলাম, তখন এই শহরেই রয়ে গেলাম। এই শহরটার সঙ্গে আমার একটা নাড়ির যোগ আছে; প্রথম যখন সাব-ইন্সপেক্টর হয়ে পুলিসে ঢুকেছিলাম, তখন এই শহরেই পোস্টেড হয়েছিলাম। আবার রিটায়ার করলাম এই শহর থেকেই।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'শহরটার ওপর মায়া পড়ে গেছে আর কি। কতদিন রিটায়ার করেছেন?'

'সাত বছর।'

এই সময় ভৃত্য আসিয়া দুই ছিলিম তামাক দু'টি গড়গড়ার মাথার উপর বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

নীলমণিবাবু একটি গড়গড়ার নল হাতে লইলেন, অন্যটি লইল ব্যোমকেশ। কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান চলিল। উৎকৃষ্ট তামাক; ধূম-গন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশকে প্রথমে দেখিয়া এবং তাহার পরিচয় পাইয়া অনেকেই তাহাকে পরম কৌতূহলের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। নীলমণিবাবুও তামাক টানিতে টানিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিরীক্ষণের মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল। ভক্ত-সুলভ পুলক-বিহ্বলতা একেবারেই ছিল না; বরং তিনি যেন চক্ষু দিয়া ব্যোমকেশকে তৌল করিতেছিলেন, ব্যোমকেশের খ্যাতি ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে কতটা সামঞ্জস্য আছে তাহাই ওজন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। নীলমণিবাবু বুদ্ধিজীবী পুলিস কর্মচারী ছিলেন, স্বচক্ষে দেখিয়া মানুষের চরিত্র নির্ণয় করা তাঁহার কাজ ছিল; পরের মুখে ঝাল খাইবার লোক তিনি নন। তাই ব্যোমকেশকে তিনি নিজের বুদ্ধির নিকষে যাচাই করিয়া লইতে চান।

অবশেষে গড়গড়ার নলটি মুখ হইতে সরাইয়া তিনি যখন কথা বলিলেন, তখন তাঁহার কথার মধ্যেও এই প্রচ্ছন্ন অনুসন্ধিৎসা বক্রভাবে প্রকাশ পাইল। তিনি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনাকে নিয়ে লেখা রহস্য কাহিনীগুলি সবই আমি পড়েছি। লক্ষ্য করেছি, সব সমস্যাই আপনি সমাধান করেছেন। তাই জানতে ইচ্ছে হয়, আপনি কি কখনো কোনো রহস্যের মর্মোদ্‌ঘাটনে অকৃতকার্য হননি? কখনো কি ভুল করেননি?'

ব্যোমকেশ গড়গড়ার নল আমার হাতে দিয়া সবিনয়ে হাসিল। বলিল, 'কখনো ভুল করিনি এত বড় কথা বলার স্পর্ধা আমার নেই। নীলমণিবাবু, আমি সত্যান্বেষী। ভুল-ভ্রান্তি অনেক করেছি; এমনও অনেকবার হয়েছে যে অপরাধীকে ধরতে পারিনি। কিন্তু সত্যের সন্ধান

পাইনি এমন বোধ হয় কখনো হয়নি। অবশ্য বলতে পারেন আমি ক'টা রহস্যই বা পেয়েছি। আমার চেয়ে হাজার গুণ বেশি রহস্য ঘটনা নিয়ে কাজ করেছেন আপনি। আপনি যতদিন চাকরিতে ছিলেন প্রত্যহ দু'চারটে ছোট-বড় কেস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। আমাকে যদি তাই করতে হত, আমারও অসংখ্য কেস অমীমাংসিত থেকে যেত সন্দেহ নেই।'

ব্যোমকেশের উত্তর শুনিয়া নীলমণিবাবু মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন মনে হইল। তিনি যখন আবার কথা বলিলেন তখন তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটু ঘনিষ্ঠতার সুর ধ্বনিত হইল। তিনি বলিলেন, 'দেখুন ব্যোমকেশবাবু, পুলিসের কাজে অনেক ঝামেলা। চুনোপুঁটির কারবারই বেশি, রুই-কাৎলা কদাচিৎ মেলে। আবার মজা জানেন, ওই চুনোপুঁটিগুলোকেই ধরতে প্রাণ বেরিয়ে যায়, রুই-কাৎলা ধরা খুব শক্ত নয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা বটে। ডাক্তারেরা বলেন শক্ত রোগের ওষুধ আছে, সর্দি-কাশি সারানোই কঠিন। তা—আপনার চারে যে-ক'টি রুই-কাৎলা এসেছে তাদের সকলকেই আপনি খেলিয়ে ডাঙায় তুলেছেন নিশ্চয়।'

নীলমণিবাবু কিছুক্ষণ উত্তর দিলেন না। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হাতের নলটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। তারপর ব্যোমকেশের দিকে একটি সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানিয়া বলিলেন, 'সব মাছই ডাঙায় তুলেছি ব্যোমকেশবাবু, কেবল একটি বাদে। আমার পুলিস-জীবনের শেষ বড় কেস। এই শহরেই ব্যাপারটা ঘটেছিল। কিন্তু কিনারা করতে পারলাম না।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'আসামী কে তা জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু প্রমাণ পেলেন না?'

নীলমণিবাবু ঈষৎ দ্বিধাভরে বলিলেন, 'একটা লোককে পাকা রকম সন্দেহ করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই তার অ্যালিবাই ভাঙতে পারলাম না। তারপর এমন একটা ঘটনা ঘটল যে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সত্যিকার আসামী যে কে সে সম্বন্ধে ধোঁকা আর কাটল না।'

'হুঁ,' বলিয়া ব্যোমকেশ আমার হাত হইতে নল লইল এবং তাকিয়ায় ঠেস দিয়া টানিতে লাগিল। নীলমণিবাবু ব্যোমকেশের উপর চক্ষু স্থির রাখিয়া গড়গড়ায় একটি লম্বা টান দিলেন, তারপর নল রাখিয়া দিয়া বলিলেন, 'আপনি গল্পটা শুনবেন?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিল, বলিল, 'বেশ তো, বলুন না। ভারি চমকপ্রদ গল্প হবে মনে হচ্ছে।'

'চমকপ্রদ কিনা আপনি বিচার করবেন। আমি যা-যা জানি সব আপনাকে বলছি। হয়তো আপনি আসামীকে সনাক্ত করতে পারবেন।' বলিয়া নীলমণিবাবু একটু হাসিলেন।

ইহা শুধু গল্প শুনাইবার প্রস্তাব নয়, ইহার অন্তরালে একটি চ্যালেঞ্জ রহিয়াছে। নীলমণিবাবু যেন ব্যোমকেশকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—এস দেখি, তোমার কত বুদ্ধি প্রমাণ কর।

ব্যোমকেশ কিন্তু রণাহ্বান গায়ে মাখিল না, হাসিয়া বলিল, 'আরে না না, আপনার মত অভিজ্ঞ পুলিস কর্মচারী যার কিনারা করতে পারেনি, আমার দ্বারা কি তা হবে? তবে গল্প শোনার কৌতূহল আছে। আপনি বলুন।'

আমরা নীলমণিবাবুর কাছে সরিয়া আসিয়া বসিলাম। তিনি পকেট হইতে একটা কৌটা বাহির করিয়া এক চিমটি জর্দা মুখে দিলেন। পান নয়, শুধু জর্দা। ইহাই বোধ হয় তাঁহার আসল নেশা।

তিনি গলা ঝাড়া দিয়া গল্প আরম্ভ করিবার উপক্রম করিতেছেন, বীরেনবাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'আর এক দফা চা হবে নাকি? মধ্যাহ্ন ভোজনের এখনো বিস্তর দেরি। বিয়ে-বাড়ির ব্যাপার—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুক চা। এবং সেই সঙ্গে আর এক প্রস্থ তামাক।'

সম্মুখে চায়ের পেয়ালা এবং বাঁ হাতে গড়গড়ার নল লইয়া আমরা বসিলাম। নীলমণি মজুমদার তাঁহার স্বাভাবিক গম্ভীর গলায় গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন।—

রিটায়ার করিবার বছর তিনেক আগে নীলমণিবাবু এই জেলার সদর থানার কর্তা হইয়া আসেন। তাঁহার তিনটি প্রধান গুণ ছিল : যে-বুদ্ধি থাকিলে তদন্তকর্মে কৃতকার্য হওয়া যায় সে-বুদ্ধি তাঁহার প্রচুর পরিমাণে ছিল ; তিনি অতিশয় কর্মঠ ছিলেন ; এবং তিনি ঘুষ লইতেন না। শহরটা পুলিস সেরেস্তায় দাগী শহর বলিয়া পরিচিত ছিল ; খুন-জখম এবং আরও নানা প্রকার অবৈধ ক্রিয়াকলাপ এখানে লাগিয়া থাকিত। নীলমণিবাবু পূর্ব হইতে এ শহরের সহিত পরিচিত ছিলেন, শহরের ধাত জানিতেন। তিনি আসিয়া দৃঢ় হস্তে শাসনের ভার তুলিয়া লইলেন।

বছর দেড়েক কাটিয়া গেল। নীলমণিবাবুর সতর্ক শাসনে শহর অনেকটা শান্ত-শিষ্ট ভাবে আছে। নীলমণিবাবুর অভ্যাস ছিল হপ্তায় দু'একবার কাহাকেও কিছু না বলিয়া গভীর রাত্রে সাইকেলে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতেন। শহরের একটা অংশ ছিল বিশেষভাবে অপরাধপ্রবণ ; তাহারই অন্ধকার অলিগলিতে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন ; পাহারাওয়ালারা নিয়মিত রোঁদ দিতেছে কিনা লক্ষ্য করিতেন। তাঁহার সাইকেলে আলো থাকিত না ; সঙ্গে থাকিত পিস্তল এবং একটি বৈদ্যুতিক টর্চ। প্রয়োজন হইলে টর্চ জ্বালিতেন।

যে-রাত্রির ঘটনাটা লইয়া এই কাহিনীর আরম্ভ সে-রাত্রে নীলমণিবাবু সাইকেল চড়িয়া যথারীতি বাহির হইয়াছেন। নিষুতি রাত, কোথাও জনমানব নাই, রাস্তার আলোগুলো দূরে দূরে মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। ভদ্র পাড়া যেখানে অভদ্র পাড়ার সঙ্গে মিশিয়াছে সেইখানে আম-কাঁঠালের বাগান-ঘেরা কয়েকটা পুরাতন বাড়ি আছে। বাড়িগুলি জীর্ণ, আম-কাঁঠালের গাছগুলি বর্ষীয়ান। পূর্বে বোধ হয় এই স্থান ভদ্রপল্লীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন ভদ্রপল্লী ঘৃণাভরে দূরে সরিয়া গিয়াছে ; ক্ষয়িষ্ণু বাড়িগুলি দুই পক্ষের মাঝখানে সীমানা রক্ষা করিতেছে। এখানে যাহারা বাস করে তাহাদের সামাজিক অবস্থাও ত্রিশঙ্কুর মত স্বর্গ ও মর্তের মধ্যবর্তী।

মন্থর গতিতে সাইকেল চালাইয়া এই পাড়ার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে নীলমণিবাবু দেখিলেন, সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে কয়েকজন লোক একটি মাচার মত বস্তু কাঁধে লইয়া একটি বাড়ির ফটক হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহাদের ভাবভঙ্গী সন্দেহজনক।

নীলমণিবাবু জোরে সাইকেল চালাইলেন ; কাছাকাছি আসিয়া বৈদ্যুতিক টর্চ জ্বালিয়া লোকগুলার মুখে ফেলিলেন, উচ্চকণ্ঠে হুকুম দিলেন, 'দাঁড়াও।'

চারজন লোক ছিল ; তাহার একসঙ্গে কাঁধ হইতে মাচা ফেলিয়া পলায়ন করিল, মুহূর্তমধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু অদৃশ্য হইবার পূর্বে একজনের মুখ নীলমণিবাবু অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন ; সে ওই বাড়ির মালিক সুরেশ্বর ঘোষ।

পলাতকেরা বিভিন্ন দিকে গিয়াছে, নীলমণিবাবু তাহাদের ধরিবার চেষ্টা করিলেন না। তিনি মাচার নিকট গিয়া সাইকেল হইতে নামিলেন, এবং মাচার উপর টর্চের আলো ফেলিলেন।

মাচা নয়, মড়া বহিবার চালি। তাহাতে বাঁধা-ছাঁদা অবস্থায় পড়িয়া আছে একটি স্ত্রীলোকের দেহ। স্বাস্থ্যবতী সধবা যুবতী, দেহে কোথাও আঘাতের চিহ্ন নাই ; কিন্তু মৃত।

নীলমণিবাবু হুইসল্ বাজাইলেন। একজন পাহারাওয়ালা কনস্টেবল কাছেপিঠে ছিল, দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিল। প্রতিবেশীরাও ঘুম ভাঙিয়া নিজ নিজ গৃহ হইতে বাহির হইল।

প্রতিবেশীরা সকলেই মৃতদেহ সনাক্ত করিল ; সুরেশ্বরের স্ত্রী হাসি। বাড়িতে অন্য কেহ থাকে না, কেবল সুরেশ্বর ও তাহার স্ত্রী হাসি।

নীলমণিবাবু কনস্টেবলকে থানায় রওনা করিয়া দিলেন, তারপর দু'জন প্রতিবেশীকে লইয়া বাড়ি অনুসন্ধান করিলেন। বাড়িটি একতলা হইলেও আকারে ছোট নয়, ছয়খানি ঘর। কিন্তু অধিকাংশ ঘরই ব্যবহার হয় না। দুইটি ঘরে ব্যবহারের চিহ্ন পাওয়া যায় ; তন্মধ্যে একটি শয়নের ঘর। এই ঘরটি বেশ বড়, তাহার দুই পাশে দুইটি খাট। দুইটি খাটেই বিছানা পাতা ; একটিতে কেহ শয়ন করে নাই, অপরটি দেখিয়া মনে হয় ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু বাড়িতে কেহ নাই।

বাগানেও কেহ নাই ; বড় বড় আম-কাঁঠালের গাছগুলা সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নীলমণিবাবু প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মেয়েটির অসুখ করেছিল কিনা আপনারা জানেন ?'

একজন প্রতিবেশী বলিল, 'অসুখ করেনি। আজই বিকেলবেলা ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে বিনোদবাবুর সঙ্গে কথা বলছিল ?'

'তাই নাকি ! বিনোদবাবু কে ?'

'বিনোদ সরকার, সোনারূপোর দোকান আছে।'

ফটকের কাছে ফিরিয়া আসিয়া নীলমণিবাবু দেখিলেন, থানা হইতে দুইজন সাব-ইন্সপেক্টর ও কয়েকজন জমাদার কনস্টেবল প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তিনি অল্প কথায় ব্যাপার বুঝাইয়া দিয়া একজন সাব-ইন্সপেক্টরের সঙ্গে মৃতদেহ হাসপাতালে রওনা করিয়া দিলেন, চারজন কনস্টেবল চালি বহিয়া লইয়া গেল।

প্রতিবেশীরা তখনও কেহ চলিয়া যায় নাই, নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করিয়া জল্পনা করিতেছিল। নীলমণিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মেয়েটির স্বামীর পুরো নাম কি ?'

একজন বলিল, 'সুরেশ্বর ঘোষ।'

'সে কোথায় ?'

প্রতিবেশীরা কিছু বলিতে চায় না ; শেষে একজন অনিচ্ছাভরে বলিল, 'সুরেশ্বর সন্ধ্যের পর খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে যায়, রাত্রি একটা-দেড়টার আগে বাড়ি ফেরে না।'

'কোথায় যায় ?'

'শুনেছি কালীকিঙ্কর দাসের দোকানে তাসের আড্ডা বসে, সেখানে যায়।'

'কালীকিঙ্কর দাসের দোকান কোথায় ?'

প্রতিবেশীরা ঠিকানা দিল। নীলমণিবাবু তখন জমাদারকে অকুস্থলে বসাইয়া সাব-ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে লইয়া কালীকিঙ্কর দাসের দোকানের উদ্দেশ্যে চলিলেন। প্রতিবেশীদের বলিয়া গেলেন, 'কাল সকালে আসব, আপনাদের এজেহার নেব।'

কালীকিঙ্করের দোকান সুরেশ্বরের বাড়ি হইতে আধ মাইল দূরে, শহরের নিকৃষ্ট অংশ পার হইয়া যেখানে বাজার-হাট আরম্ভ হইয়াছে সেইখানে। লোহা-লক্কড়ের দোকান। বাজারের এই অংশটির নাম লোহাপটি।

নিষুতি বাজারের ভিতর দিয়া নীলমণিবাবু কালীকিঙ্করের দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দোকানের সামনে রাস্তার পাশে ভারী ভারী লোহার ছড় গুচ্ছাকারে পড়িয়া আছে। কিন্তু দোকানের দ্বার বন্ধ। নীলমণিবাবু নিঃশব্দ পদে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া দেখিলেন, পাশের একটি জানালার ফুটা দিয়া শীর্ণ আলোকরশ্মি বাহিরে আসিতেছে। তিনি সন্তর্পণে জানালার কাছে গিয়া ফুটার মধ্যে চক্ষু নিবিষ্ট করিলেন।

তক্তপোশের উপর ফরাস পাতা ; চারজন লোক বসিয়া নিবিষ্টমনে তাস খেলিতেছে। তাহাদের মাঝখানে ফরাসের উপর কিছু টাকা ও নোট জমা হইয়াছে। বাজি রাখিয়া খেলা চলিতেছে। তিন তাসের খেলা।

সাব-ইন্সপেক্টর সাইকেল লইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া ছিল। নীলমণিবাবু হাত নাড়িয়া তাহাকে ইশারা করিলেন, সে সাইকেল রাস্তায় শোয়াইয়া দিয়া দ্বারের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। নীলমণিবাবু তখন জানালায় টোকা দিলেন।

চারজন খেলোয়াড় একসঙ্গে জানালার দিকে ঘাড় ফিরাইল, চারজোড়া চোখ শঙ্কিত উৎকণ্ঠায় চাহিয়া রহিল ; তারপর একজন এক খামচায় সম্মুখের টাকাকড়ি তুলিয়া লইয়া পকেটে পুরিল।

নীলমণিবাবু কড়া সুরে বলিলেন, 'দোর খোল।'

চারজন মুখ তাকাতাকি করিল, তারপর একজন গলা উঁচু করিয়া বলিল, 'কে ?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'পুলিস। দোর খোল।'

আবার খেলোয়াড়দের মধ্যে মুখ তাকাতাকি। তারপর একজন, বোধ হয় দোকানের মালিক কালীকিঙ্কর দাস, উঠিয়া গেল। নীলমণিবাবু জানালা হইতে সরিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দ্বার খুলিল। রোগা অস্থিসার লোকটা দুইজন ইউনিফর্ম-পরা পুলিস কর্মচারীকে দেখিয়া এক পা পিছাইয়া গেল, 'কে ! কি চাই ?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'তুমি কালীকিঙ্কর দাস ?'

'হ্যাঁ। কি চাই ?'

'এখানে আর কে কে আছে ?'

কালীকিঙ্কর ঢোক গিলিয়া বলিল, 'আমার তিনজন বন্ধু আছে।'

নীলমণিবাবু আর বাক্যব্যয় করিলেন না, ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে লইয়া দোকানে প্রবেশ করিলেন। পাশে অফিস-ঘরের দরজা ; অফিস-ঘরে গিয়া তিনি দেখিলেন, তিনজন খেলোয়াড় তখনও ফরাসের উপর বসিয়া আছে, একজন তাস ভাঁজিতেছে। তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া সকলকে নিরীক্ষণ করিলেন। সকলেরই বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে, চেহারায় কোনও বৈশিষ্ট্য নাই। কেবল এক ব্যক্তি, যে-ব্যক্তি তাস ভাঁজিতেছিল, হাড়ে-মাসে মজবুত গোছের লোক। দেখিয়া মনে হয় এই লোকটাই পালের গোদা।

নীলমণিবাবু প্রশ্ন করিলেন, 'সুরেশ্বর ঘোষ কার নাম ?'

মজবুত লোকটি ভুরু তুলিয়া চাহিল, তারপর তাস রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, 'আমি সুরেশ্বর ঘোষ। কি দরকার ?' তার স্বর শান্ত ও সংযত।

নীলমণিবাবু একে একে চারজনের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিলেন, 'তোমরা দুপুর রাত্রে মড়া নিয়ে ঘাটে পোড়াতে যাচ্ছিলে। ভেবেছিলে একবার পুড়িয়ে ফেলতে পারলে আর কোনো ভয় নেই।'

চারজনের মুখেই অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। সুরেশ্বর বলিল, 'মড়া। কি বলছেন ! কার মড়া ?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'ন্যাকামি করে পার পাবে না। আমি দেখেছি তোমাকে। যে-চারজন মড়া নিয়ে যাচ্ছিল, তুমি তাদের একজন।'

সুরেশ্বর বলিল, 'কবেকার কথা বলছেন ?'

'আজকের কথা বলছি। আজ রাত্রি বারোটার কথা।'

'বাজে কথা বলছেন। আজ রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আমরা এখানে তাস খেলতে

বসেছি, এক মিনিটের জন্যে কেউ বাইরে যাইনি।'

'বটে! সারাক্ষণ তাস খেলেছ! জুয়া?'

তিনজনে ঘাড় চুলকাইতে লাগিল। সুরেশ্বর কিন্তু তিলমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, 'হ্যাঁ, জুয়া খেলছিলাম। আমরা চার বন্ধু মিলে মাঝে মাঝে খেলি।'

নীলমণিবাবু দেখিলেন এখানে ইহাদের কাবু করা যাইবে না, থানায় লইয়া যাইতে হইবে। বলিলেন, 'আপাতত জুয়া খেলার অপরাধে আমি তোমাদের অ্যারেস্ট করছি। থানায় চল।'

অতঃপর কিছুক্ষণ কথা-কাটাকাটি চলিল, শেষ পর্যন্ত তাহারা থানায় যাইতে রাজী হইল। নীলমণিবাবু বলিলেন, 'যদি জামিন যোগাড় করতে পার, আজ রাত্তিরেই ছেড়ে দেব।'

রাস্তায় কিছুদূর যাইবার পর সুরেশ্বর বলিল, 'মড়ার কথা কী বলছিলেন? কার মড়া?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'তোমার স্ত্রীর।'

সুরেশ্বর রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িল, 'অ্যাঁ! আমার স্ত্রী! কি বলছেন আপনি?'

'বলছি, তোমার স্ত্রী খুন হয়েছে।'

'না না! এসব কি রকম কথা! আমি বিশ্বাস করি না। হাসি!—না, আমি বাড়ি চললাম।'

'বাড়ি গিয়ে কোন লাভ নেই। মৃতদেহ হাসপাতালে চালান দেওয়া হয়েছে।'

থানায় পৌঁছিয়া নীলমণিবাবু চারজনকে হাজতে পুরিলেন। তারপর অফিসে বসিয়া একে একে তাহাদের জেরা আরম্ভ করিলেন। প্রথমে ডাকিলেন সুরেশ্বরকে। সে টেবিলের পাশের একটি চেয়ারে উপবিষ্ট হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি কাজ কর?'

সুরেশ্বর বলিল, 'অনেক রকম ব্যবসা আছে। পাইকিরি ব্যবসা। আমি পয়সাওয়ালা লোক, পুঁচকে দোকানদার নই।'

'বাড়িটা তোমার?'

'হ্যাঁ।'

'কতদিন কিনেছ?'

'পাঁচ-ছয় বছর হবে। উনিশ হাজার টাকায় কিনেছিলাম।'

নীলমণিবাবুকে টাকার কথা শুনাইয়া লাভ হইল না, তিনি অটলভাবে প্রশ্ন করিয়া চলিলেন, 'কতদিন আগে বিয়ে করেছিলে?'

'সাত বছর আগে।'

'শ্বশুরবাবাড়ি কোথায়?'

'এই শহরে।'

'শ্বশুরের নাম কি?'

'দিনমণি হালদার।'

'সে এখন কোথায়?'

'জানি না। সম্ভবত জেলে।'

'জেলে?'

'হ্যাঁ। জেল আমার শ্বশুরের ঘর-বাড়ি।'

'হুঁ। শ্বশুরের সঙ্গে তোমার সদ্ভাব আছে?'

'মুখ দেখাদেখি নেই।'

নীলমণিবাবু কিছুক্ষণ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, 'বৌয়ের সঙ্গে তোমার সদ্ভাব ছিল?'

একটু দ্বিধা করিয়া সুরেশ্বর বলিল, 'বিয়ের সাত বছর পরে যতটা সম্ভাব থাকা সম্ভব ততটা ছিল।'

'ছেলে-পিলে নেই?'

'না। বৌ বাঁজা।'

নীলমণিবাবু আঙুল তুলিয়া বলিলেন, 'আজ রাত্রি বারোটার সময় তুমি আর তোমার বন্ধুরা মিলে তোমার স্ত্রীর মৃতদেহ বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যাচ্ছিলে, আমি টর্চের আলো ফেলে তোমাকে দেখেছি।'

সুরেশ্বর নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলিল, 'আপনি ভুল দেখেছেন। রাত্রি বারোটার সময় আমি আর আমার বন্ধুরা কালীকিঙ্করের দোকানে বসে তাস খেলছিলাম।'

'হুঁ। তোমার স্ত্রীর স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল?'

'মেয়েমানুষের স্বভাব-চরিত্রের কথা কে বলতে পারে? তবে পাড়া-পড়শীরা বদনাম দিত।'

'কি বদনাম দিত?'

'আমি রাত্রি করে বাড়ি ফিরি। কয়েক মাস থেকে কে একজন নাকি বাগানে এসে হাসির সঙ্গে দেখা করত।'

'স্ত্রীকে এ বিষয়ে কিছু জিগ্যেস করেছিলে?'

'করেছিলাম। সে বলেছিল সব মিথ্যে কথা।'

'আর কিছু?'

'আর কি! একবার হাসির আলমারি খুলে তার মধ্যে এমন কয়েকটা গয়না দেখেছিলাম যা আমি তাকে দিইনি।'

'কোথা থেকে গয়না এল বৌয়ের কাছে খোঁজ নিয়েছিলে?'

'কি হবে খোঁজ নিয়ে? মেয়েমানুষ যদি নষ্ট হতে চায় কেউ তাকে আটকাতে পারে না।'

'কিন্তু খুন করতে পারে।'

'আমি হাসিকে খুন করিনি।'

নীলমণিবাবু আরও অনেকক্ষণ নানাভাবে জেরা করিলেন, কিন্তু সুরেশ্বরকে টলাইতে পারিলেন না। বরং তাহার ঠোঁট-কাটা স্পষ্টবাদিতা দেখিয়া মনে হয় সে সত্য কথা বলিতেছে।

সুরেশ্বরকে হাজতে ফেরৎ পাঠাইয়া নীলমণিবাবু কালীকিঙ্করকে ডাকিয়া আনিলেন। কালীকিঙ্কররের হাড়-বাহির-করা শরীরের মধ্যে লৌহ-কঠিন একটি মন ছিল, নীলমণি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা বাঁকাইতে পারিলেন না। চার বন্ধু রাত্রি সাড়ে আটটার সময় তাহার দোকানে তাস খেলিতে বসিয়াছিল, নীলমণিবাবু আসা পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও কেহ বাহিরে যায় নাই, এ কথার নড়চড় হইল না।

অন্যান্য বিষয়ে কিন্তু কালীকিঙ্কর সোজাসুজি উত্তর দিল। সুরেশ্বর তাহার আজীবনের বন্ধু, তাহার ঘরের খবর সবই কালীকিঙ্কর জানে। সুরেশ্বরের অবস্থা আগে ভাল ছিল না, যুদ্ধের বাজারে সে পয়সা করিয়াছে। হাসিকে সে বিবাহ করিয়াছিল গরীব অবস্থায়। হাসির বাপটা ছিল একাধারে চোর এবং বোকা; চুরি করিয়া ধরা পড়িয়া যাইত এবং জেলে যাইত। হাসির মায়েরও বদনাম ছিল। বস্তিতে বাস করিলে ভদ্রলোকের মেয়েরও চালচলন খারাপ হইয়া যায়; যেমন দেখিবে তেমনি তো শিখিবে। হাসির বাপ যখন জেলে থাকিত তখন নাকি হাসির মায়ের ঘরে লোক আসিত। সুরেশ্বর যখন হাসিকে বিবাহ করিতে উদ্যত হয়, তখন

বন্ধুরা সকলেই মানা করিয়াছিল ; কিন্তু সুরেশ্বর কাহারও কথা শুনিল না। তারপর যুদ্ধের বাজারে সুরেশ্বর টাকা করিয়াছে, বাড়ি কিনিয়াছে ; কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তেমন বনিবনাও নাই। সুরেশ্বর বাড়িতে বেশি থাকে না, বাহিরে বাহিরে দিন কাটায়। কিন্তু তাই বলিয়া সে স্ত্রীকে খুন করিয়াছে একথা একেবারেই সত্য নয়। সুরেশ্বর তেমন লোকই নয়। সে ভদ্র সন্তান ; জীবনের আরম্ভে অনেক দুঃখ-কষ্ট পাইয়া বস্তিতে থাকিয়া বড় হইয়াছে বটে, কিন্তু তার মনটা খুব উঁচু।

কালীকিঙ্করের বন্ধু-প্রশস্তি শেষ হইলে নীলমণিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সুরেশ্বরের শ্বশুর দিনমণি হালদার এখন কোথায় ?'

কালীকিঙ্কর বলিল, 'বছর দুই আগে দিনু হালদার জেল থেকে বেরিয়ে এখানে এসেছিল। হাসির মা তখন মরে গেছে। দিনু হালদার দু'তিন দিন মেয়ে-জামাইয়ের কাছে ছিল। একদিন সুরেশ্বরের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। দিনু হালদার কোথায় চলে গেল। তারপর থেকে আর তাকে দেখিনি। বয়স হয়েছিল, জেল খেটে শরীরও ভেঙে পড়েছিল। হয়তো মরে গেছে।'

অতঃপর নীলমণিবাবু কালীকিঙ্করকে ফেরৎ পাঠাইয়া দেবু মণ্ডলকে আনাইলেন। দেবু মণ্ডল কয়লা ও জ্বালানি কাঠের ব্যবসা করে ; বিত্তবান ব্যক্তি। সুরেশ্বরের বাল্যবন্ধু, সুখে-দুঃখে নিত্য-সহচর। সুরেশ্বরের স্ত্রীকে খুন করিয়া তাহারা পোড়াইতে লইয়া যাইতেছিল একথা সর্বৈব মিথ্যা। তাহারা তাস খেলিতেছিল। বন্ধু-পত্নীর চরিত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে সে অক্ষম ; তবে হাসি সদ্‌বংশের মেয়ে ছিল না একথা যথার্থ।

দেবু মণ্ডলকে নীলমণিবাবু ভাঙিতে পারিলেন না, নূতন কোনও তথ্যও আবিষ্কৃত হইল না। তিনি অবশেষে বলিলেন, 'শ্মশান ঘাটে তোমার কাঠের আড়ৎ আছে ?'

দেবু মণ্ডল থতমত খাইয়া বলিল, 'আছে। শহরে দুটো আড়ৎ আছে, আর শ্মশানে একটা।'

নীলমণিবাবু কুঞ্চিত চক্ষে কিছুক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'এবার সত্যি কথা বলবে ?'

দেবু মণ্ডল বলিল, 'সত্যি কথাই বলছি।'

চতুর্থ ব্যক্তির নাম বিলাস দত্ত। ঠিকাদারদের কাজ করে, বিল্‌ডিং কন্‌ট্রাক্টর ; অতিশয় মিষ্টভাষী ও রসিক। নীলমণিবাবুকে একটি অশ্লীল রসিকতা শুনাইয়া ঘাড় নিচু করিয়া জিভ কাটিল। তাস খেলার ব্যাপার সম্বন্ধে কিন্তু তাহার মনে লেশমাত্র সংশয় নাই। নীলমণিবাবু দেখিলেন বিলাস দত্ত যে শ্রেণীর লোক, সে অজস্র মিথ্যা কথা বলিবে কিন্তু কাজের কথা একটিও বলিবে না। তিনি হতাশ হইয়া বলিলেন, 'তুমি ঠিকাদার, তোমার অনেক বাঁশ আছে ?'

বিলাস দত্ত বলিল, 'বাঁশ ! আছে বৈকি, এন্তার বাঁশ আছে। ভারা বাঁধবার জন্যে দরকার হয় কিনা।'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'হুঁ, মড়ার চালি বাঁধবার জন্যেও দরকার হয়।'

বন্ধু চতুষ্টয়ের জেরা শেষ করিতে রাত কাবার হইয়া গেল।

পরদিন কিন্তু তাহাদের আর হাজতে আটকাইয়া রাখা গেল না। তাহাদের উকিল জামিন দিয়া তাহাদের খালাস করিয়া লইয়া গেলেন। নীলমণিবাবুর মনে অভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সুরেশ্বর ঘোষ স্ত্রীকে খুন করিয়াছে এবং বাকি তিনজন এই ব্যাপারে লিপ্ত আছে। কিন্তু প্রমাণ নাই ; তিনি যাহা চোখে দেখিয়াছেন তাহার কোন সমর্থক নাই ; তাঁহার সাক্ষ্য উকিলের জেরায় উড়িয়া যাইবে। তাই বর্তমানে তিনি তাহাদের নামে খুনের অভিযোগ আনিতে

পারিলেন না। কেবল জুয়া খেলার অভিযোগেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।

তিনি কিন্তু খুনের তদন্তে বিরতি দিলেন না। তিনি দুইজন সহকারী লইয়া সুরেশ্বরের প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করিলেন, তাহাদের বয়ান শুনিলেন। শেষে বেলা প্রায় একটার সময় সুরেশ্বরের বাড়িতে গেলেন। ফটকে একজন কনস্টেবল পাহারায় ছিল, সে বলিল, সুরেশ্বর বেলা এগারোটা নাগাদ ফিরিয়া আসিয়াছে এবং বাড়িতে আছে।

নীলমণিবাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সুরেশ্বর শনয়কক্ষের একটা খাটে শুইয়া ঘুমাইতেছে। পুলিসের জুতার শব্দে সে রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিল, জড়িত স্বরে বলিল, 'আবার কী চাই?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'আমরা বাড়ি তল্লাশ করতে এসেছি।'

'করুন তল্লাশ। যা ইচ্ছে করুন।' বলিয়া সে আবার শয়নের উপক্রম করিল। তাহার বোধ হয় বেলা পর্যন্ত ঘুমানো অভ্যাস, তার উপর কাল সারা রাত্রি জাগরণে গিয়াছে, আজ বোধ হয় সারা দিন ঘুমাইবে। কিন্তু—স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহার মনে কি একটুও দাগ পড়ে নাই? খুন করুক বা না করুক, এমন নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইতেছে কি করিয়া!'

যাহোক, নীলমণিবাবু তাহাকে ঘুমাইতে দিলেন না। বলিলেন, 'তোমার স্ত্রীর গয়নাগুলো দেখতে চাই।'

সুরেশ্বর বিরক্ত মুখে উঠিয়া একটা দেয়াল-আলমারির কপাট খুলিল, তাহার একটা তাকে কাপড়-চোপড়ের পেছন হইতে এক থাবা সোনার গহনা বাহির করিল। আটপৌরে গহনা কিছু আছে, তাছাড়া তোলা গহনা। নীলমণিবাবু বলিলেন, 'এর মধ্যে কোন্ গয়না তুমি দাওনি?'

সুরেশ্বর একটা আংটি, এক জোড়া কানের দুল, একটা চুলের কাঁটা বাছিয়া তাঁহার হাতে দিল। এ গহনাগুলি নূতন, ব্যবহৃত হয় নাই।

নীলমণিবাবু সেগুলি নিজের পকেটে রাখিয়া বলিলেন, 'এগুলো আমি রাখছি। পরে ফেরৎ দেব।'

তারপর তাহার সমস্ত বাড়ি ও বাগান তন্ন তন্ন করিলেন, কিন্তু এমন কিছুই পাওয়া গেল না যাহা হইতে হাসির মৃত্যুর কোন হদিস পাওয়া যায়।

বৈকালে সাড়ে তিনটার সময় নীলমণিবাবু সুরেশ্বরের বাড়ির তদন্ত শেষ করিলেন এবং সহকারীদের ফেরৎ পাঠাইয়া নিজে বিনোদ সরকারের দোকানের দিকে চলিলেন। বাজারের মধ্যে বিনোদ সরকারের সোনা-রূপার দোকানটা তাঁহার দেখা ছিল, বেশ বড় দোকান, দোকানের মধ্যে কারিগরদের কাজ করিবার কারখানা।

বিনোদবাবু দোকানে ছিলেন, একটি সুসজ্জিত কক্ষে টেবিলের সামনে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিলেন। লোকটির বয়স অনুমান পঞ্চাশ, কিন্তু ভারি শৌখিন মানুষ। গায়ে তসরের পাঞ্জাবি, গিলে করা ফরাসডাঙার ধুতি, গোঁফের উপর-নীচে কামাইয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম করিয়া তোলা হইয়াছে, মাথার সম্মুখ ভাগে এক গোছা চুল তিনদিক হইতে টাকের আক্রমণ কোনমতে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। আকৃতি একটু খর্ব, কিন্তু তদনুপাতে বেশ গোলগাল।

পুলিস দেখিয়া তিনি একটু বিব্রত হইলেন, বলিলেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো? আমার দোকানে কি কোন গণ্ডগোল হয়েছে?'

নীলমণিবাবু সামনের চেয়ারে বসিলেন, বলিলেন, 'না। আপনার কাছে কিছু খবর জানতে এসেছি।'

বিনোদবাবু ধাতস্থ হইলেন, নীলমণিবাবুর দিকে পানের ডিবা ও জর্দার কৌটা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'কি খবর?'

নীলমণিবাবু পান লইলেন না, জর্দার কৌটা হইতে এক চিমটি জর্দা লইয়া মুখে দিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, 'সুরেশ্বর ঘোষের স্ত্রী মারা গেছে আপনি জানেন ?'

বিনোদবাবু চেয়ার হইতে প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন, 'হাসি মারা গেছে ! সে কি ! কাল বিকেলে যে আমি তাকে দেখেছি।'

'কাল রাত্রে মারা গেছে।'

'রাত্রে ! কিন্তু বিকেলবেলা সে তো ভালই ছিল। কিসে মারা গেল ? কী হয়েছিল তার ?'

'আমার বিশ্বাস কাল রাত্রে তাকে খুন করা হয়েছে।'

'খুন !' বিনোদবাবু আস্তে আস্তে চেয়ারে বসিলেন, কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ টেবিলের উপর প্রচণ্ড চাপড় মারিয়া বলিলেন, 'সুরেশ্বর খুন করেছে। ও ছাড়া আর কেউ নয়।'

'সুরেশ্বরের কিন্তু অকাট্য অ্যালিবাই আছে।'

'থাক অ্যালিবাই, এ সুরেশ্বরের কাজ। সুরেশ্বর আর ওর ওই তিনটে বন্ধু মহা ধূর্ত আর পাজি। ওদের অসাধ্য কাজ নেই।'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'আপনি হাসিকে অনেক দিন থেকে চেনেন ?'

'ওকে তিন-চার বছর বয়স থেকে দেখে আসছি।' তিনি নলটি মুখ হইতে লইয়া কিছুক্ষণ তাহার অগ্রভাগ পরিদর্শন করিলেন, একবার নীলমণিবাবুর দিকে চকিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন ; তারপর হ্রস্ব স্বরে বলিলেন, 'আপনি পুলিস, আপনার কাছে লুকোব না, কম বয়সে আমি একটু—ইয়ে—হাসির মায়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে আজ বিশ-বাইশ বছর আগেকার কথা। হাসির বাপটা ছিল হতভাগা চোর, নেশাখোর, জালিয়াৎ। স্ত্রী-কন্যাকে খেতে দিতে পারত না। হাসির মা পেটের দায়ে—কিন্তু সে যাক। বছর কয়েক আগে হাসির মা মারা গেল। মৃত্যুকালে আমাকে ডেকে মিনতি করে বলে গিয়েছিল, হাসিকে তুমি দেখো, জামাইয়ের মন ভাল নয়।—তার মৃত্যু-শয্যার অনুরোধ আমি এড়াতে পারিনি ; হাসিকে মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতাম। হাসির মা সতীসাধ্বী ছিল না, কিন্তু তার প্রকৃতি ছিল বড় মধুর।'

কিছুক্ষণ আর কোন কথা হইল না। তারপর নীলমণিবাবু বলিলেন, 'তাহলে আপনার সন্দেহ সুরেশ্বরবাবু হাসিকে খুন করেছে ?'

বিনোদবাবু যেন স্মৃতি-সমুদ্রের তলদেশ হইতে উঠিয়া আসিলেন, 'অ্যাঁ ! হ্যাঁ, আমার তাই বিশ্বাস।'

'কিন্তু কেন ? মোটিভ কি ?'

'দেখুন, সুরেশ্বর যখন হাসিকে বিয়ে করেছিল, তখন তার চালচুলো কিছু ছিল না। তারপর যুদ্ধের বাজারে সে বড়লোক হল। তখন তার উচ্চাশা হল সে ভদ্রসমাজে মিশবে, দশজনের একজন বলে গণ্য হবে। কিন্তু হাসি বেঁচে থাকতে সে-সম্ভাবনা নেই ; হাসির মা-বাপের কেচ্ছা শহরে কে না জানে ? তাই সুরেশ্বর হাসিকে মেরেছে। এবার নতুন বিয়ে করে ভদ্রলোক হয়ে বসবে।'

'হাসির স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল ?'

'হেলাগোলা মেয়ে ছিল, মনে ছল-কপট ছিল না। একটু হয়তো পুরুষ-ঘেঁষা ছিল, ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকত, রাস্তা দিয়ে লোক গেলে ডেকে কথা কইত। কিন্তু তাতেও তাকে দোষ দেওয়া যায় না। পাড়ার মেয়েরা ওর সঙ্গে ভাল করে কথা বলত না, কেউ বা বাঁকা কথা বলত। হাসিও তো মানুষ, তারও তো কথা কইবার দুটো লোক দরকার। আমি জোর করে

বলতে পারি, অন্য দোষ তার যতই থাক, মন্দ সে ছিল না।'

নীলমণিবাবু কৌটা হইতে আর এক টিপ জর্দা মুখে দিলেন, তারপর পকেট হইতে গহনাগুলি বাহির করিয়া বিনোদবাবুর সম্মুখে রাখিলেন, 'দেখুন তো, এগুলো চিনতে পারেন?'

'হাসির গয়না নাকি?' বলিয়া বিনোদবাবু সেগুলি হাতে তুলিয়া লইলেন, তারপর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'এ গয়না আমি হাসিকে কখনো পরতে দেখিনি।'

'আপনি কখনো তাকে গয়না উপহার দেননি?'

বিনোদবাবু মাথা নাড়িলেন, 'না। আমি তাকে পুজো আর দোলের সময় একখানা করে শাড়ি দিতাম। গয়না কখনো দিইনি।'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'এ গয়না কি আপনার দোকানে তৈরি?'

বিনোদবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গহনাগুলি আবার পরীক্ষা করিলেন, বলিলেন, 'না, এ গয়না আমার কারিগরের তৈরি নয়। কিন্তু, দাঁড়ান—' তিনি ঘণ্টি টিপিয়া চাকরকে ডাকিলেন—'রামদয়ালকে পাঠিয়ে দাও।'

চশমা চোখে বয়স্থ কারিগর রামদয়াল আসিলে, তাহার হাতে গহনাগুলি দিয়া বলিলেন, 'দেখ তো, এ গয়না কি আমাদের তৈরি?'

রামদয়াল ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, 'আজ্ঞে না, এ গয়না কলকাতার কারিগরের তৈরি।'

'আচ্ছা, যাও।'

নীলমণিবাবুও উঠিলেন, গহনাগুলি পকেটে রাখিয়া বলিলেন, 'আজ তবে উঠি, যদি দরকার হয় আবার আসব।'

'যখন ইচ্ছে আসবেন।'

সেদিন সন্ধ্যাকালে নীলমণিবাবু সিভিল সার্জন মেজর বর্মণের বাংলোতে গেলেন। বাংলোতেই অফিস। মেজর বর্মণ দিনের কাজ শেষ করিয়া উঠি-উঠি করিতেছেন, নীলমণিবাবু বলিলেন, 'খবর নিতে এলাম।'

মেজর বর্মণ বলিলেন, 'বসুন। পি এম্ করেছি। রিপোর্ট কাল পাবেন।'

'কি দেখলেন? মৃত্যুর সময়?'

'আন্দাজ রাত্রি দশটা।'

'মৃত্যুর কারণ?'

'যতদূর দেখেছি গায়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল না।'

'বিষ-টিষ নাকি?'

মেজর বর্মণ একটি সিগার ধরাইয়া তাহাতে মন্দ-মন্থর টান দিলেন, 'বিষ নয়। বড় আশ্চর্য উপায়ে মেরেছে। আপনার সন্দেহভাজনের মধ্যে মিলিটারি-ম্যান কেউ আছে নাকি?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'মিলিটারি-ম্যান কেউ নেই। কিন্তু মেয়েটির স্বামী যুদ্ধের সময় মিলিটারি কন্ট্র্যাক্টর ছিল, গোরাদের সংস্পর্শে এসেছে। কী ব্যাপার বলুন?'

মেজর বর্মণ বলিলেন, 'মেয়েটির গায়ে আঘাতের চিহ্ন বাইরে থেকে দেখা যায় না, কিন্তু তার গলার তরুণাস্থি, যাকে thyroid cartilage বলে, সেটা একেবারে চূর্ণ হয়ে গেছে।'

নীলমণিবাবু স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, 'মানে গলা টিপে মেরেছে!'

'না। গলা টিপে মারলে চামড়ার ওপর আঙুলের দাগ থাকত। আর, গলা টিপে মারার মধ্যে বৈচিত্র্য কিছু নেই।'

'তবে?'

মেজর বর্মণ কয়েকবার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, 'গত মহাযুদ্ধে সৈনিকদের

অস্ত্রহীন যুদ্ধের কৌশল শেখানো হয়েছিল, আপনি জানেন ?'

'না। সে কি রকম ?'

'মনে করুন বনে-জঙ্গলে যুদ্ধ হচ্ছে। আপনি নিরস্ত্র অবস্থায় একজন সশস্ত্র শত্রুর হাতে ধরা পড়লেন। পালাবার উপায় নেই, পালাবার চেষ্টা করলে সে আপনাকে গুলি করে মারবে। এ অবস্থায় আত্মরক্ষার উপায় কি ?—আপনি কৌশলে শত্রুর ডান পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর হঠাৎ তার দিকে ঘুরে ডান হাতের পোঁচা দিয়ে সজোরে মারলেন তার গলায়। Thyroid cartilage ভেঙে গেল, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হল।'

'তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ?'

'হ্যাঁ। গলা টিপে মারতে গেলে আক্রান্ত ব্যক্তি যুদ্ধ করে মুক্ত হবার চেষ্টা করে। এতে ওসব বালাই নেই, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।'

নীলমণিবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'আশ্চর্য! মেয়েটির মৃত্যু এইভাবে হয়েছে এতে আপনার সন্দেহ নেই ?'

'কোন সন্দেহ নেই।'

'আচ্ছা, আজ উঠি। কাল সকালে লোক পাঠাব রিপোর্টের জন্যে।'

নীলমণিবাবু থানায় ফিরিয়া আসিলেন। সুরেশ্বর যে হাসিকে খুন করিয়াছে ইহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা ধোঁকা রহিয়াছে। যে লোকটা রাত্রে আসিয়া হাসির সঙ্গে দেখা করিত, সে কে ? সে-ই কি হাসিকে গহনাগুলো উপহার দিয়াছিল ? হাসির সহিত লোকটার কিরূপ সম্বন্ধ ? সে যদি হাসির 'বন্ধু' হয় তবে হাসিকে খুন করিবে কেন ?

সে-রাত্রে আর কিছু হইল না। পরদিন সকালে একজন সাব-ইন্সপেক্টর ও একজন রাইটার জমাদারকে সঙ্গে লইয়া নীলমণিবাবু আবার সুরেশ্বরের বাড়িতে গেলেন। আজ যেমন করিয়া হোক সুরেশ্বরের নিকট হইতে তিনি স্বীকারোক্তি আদায় করিবেন।

সুরেশ্বরের বাড়ির সদর দরজা খোলা, বাড়িতে কেহ আছে বলিয়া মনে হইল না। দু'চার বার ডাকাডাকি করিয়া নীলমণিবাবু সঙ্গীদের লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। শয়নকক্ষের খোলা দরজার সামনে গিয়া তাঁহাদের গতি রুদ্ধ হইল। মেঝের উপর সুরেশ্বর মরিয়া পড়িয়া আছে।

গত রাত্রে সুরেশ্বর যথা-নিয়ত কালীকিঙ্করের দোকানে তাস খেলিতে গিয়াছিল। রাত্রি আন্দাজ বারোটার সময় গৃহে ফিরিয়া আসে। তারপর কি হইয়াছে কেহ জানে না।

সিভিল সার্জেন মেজর বর্মণ সুরেশ্বরের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া রিপোর্ট দিলেন, গলার thyroid cartilage ভাঙিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। অর্থাৎ যে উপায়ে হাসির মৃত্যু হইয়াছিল ঠিক সেই উপায়ে সুরেশ্বরেরও মৃত্যু হইয়াছে।

গল্প শেষ করিয়া নীলমণিবাবু কিছুক্ষণ হেঁট মুখে বসিয়া রহিলেন, তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'এই হচ্ছে ঘটনা। তদন্তের সূত্রে আমি যা-যা জানতে পেরেছিলাম সব আপনাকে বলেছি। আমি প্রথমে সুরেশ্বরকে সন্দেহ করেছিলাম, পরে দেখলাম, হাসি আর সুরেশ্বরকে একই লোক একই উপায়ে খুন করেছে। আমি আসামীকে ধরতে পারিনি, আসামী কে তাও জানতে পারিনি। আপনি বলতে পারেন কে আসামী ?'

ব্যোমকেশ গালে হাত দিয়া শুনিতেছিল, বলিল, 'আরো কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন ?'

নীলমণিবাবু বলিলেন, 'উত্তর যদি জানা থাকে নিশ্চয় দেব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সুরেশ্বরের ওয়ারিস্ কে ?'

'সুরেশ্বরের এক খুড়তুতো বোন। সুরেশ্বর উইল করেনি। খুড়তুতো বোনটি অনাথা বিধবা, কলকাতায় কোথায় রাঁধুনি-বৃত্তি করত ; সে-ই সব পেয়েছে।'

'যাক।—যে-রাত্রে সুরেশ্বরের মৃত্যু হয়, সে-রাত্রে ওর তিন বন্ধু কালীকিঙ্কর, দেবু মণ্ডল আর বিলাস দত্ত কোথায় ছিল ?'

'সুরেশ্বরের বাড়ি যাবার পর ওরা তিনজন প্রায় সারা রাত কালীকিঙ্করের দোকানে বসে তাস খেলেছিল। আমি ওদের প্রত্যেকের পিছনে চর লাগিয়েছিলাম, তাদের কাছেই খবর পেয়েছি। ওরা সুরেশ্বরকে খুন করেনি।'

'হুঁ। বিনোদ সরকারের পিছনে চর লাগিয়েছিলেন ?'

'না। বিনোদ সরকারের ওপর আমার সন্দেহ হয়নি ; তার কোনো মোটিভ ছিল না। সুরেশ্বরকে হয়তো মারতে পারতো, কিন্তু হাসিকে মারবে কেন ?'

'তা বটে। দিনমণি হালদার তখন কোথায় ছিল খোঁজ নিয়েছিলেন ?'

'নিয়েছিলাম। সে তখন পঞ্চাশ মাইল দূরে একটা গ্রামে ছিল। আমাশায় ভুগছিল। নড়বার ক্ষমতা ছিল না। তাছাড়া ওভাবে খুন করবার কৌশল সে জানবে কোত্থেকে ?'

'হুঁ। আচ্ছা, একটা কথা বলুন। আপনার কি মনে হয় হাসির স্বভাব-চরিত্র মন্দ ছিল ?'

'না। আমার বিশ্বাস সে ভাল মেয়ে ছিল।'

ব্যোমকেশ নতমুখে ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'কিন্তু তার রক্তে দোষ ছিল। তার মা—কি নাম হাসির মায়ের ?'

'অমলা।'

ব্যোমকেশ চোখ তুলিয়া নীলমণিবাবুর পানে চাহিল ; তিনিও প্রখর চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার শরীর ক্রমশ কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দুইজনের চোখে চোখ আবদ্ধ হইয়া রহিল ; তারপর ব্যোমকেশ তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিল, নির্বাপিত গড়গড়ার নলটা হাতে তুলিয়া লইল।

নীলমণিবাবু আত্মসংবরণ করিয়া ধীরস্বরে বলিলেন, 'আর কিছু জানতে চান ?'

ব্যোমকেশ নিরুৎসুকভাবে মাথা নাড়িল, 'আর কিছু জানবার নেই।'

নীলমণিবাবু একটু বাঁকা সুরে বলিলেন, 'কিছু বুঝলেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সবই বুঝেছি, নীলমণিবাবু।'

নীলমণিবাবু কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন, 'সবই বুঝেছেন ! হাসিকে কে খুন করেছিল আপনি বুঝেছেন ?'

'বুঝেছি বৈকি। হাসিকে খুন করেছিল সুরেশ্বর।'

'তাই নাকি ! তাহলে সুরেশ্বরকে মারল কে ?'

'সুরেশ্বরকে মেরেছিল—হাসির বাপ।'

'হাসির বাপ ! কিন্তু দিনমণি হালদার সে-সময় পঞ্চাশ মাইল দূরে ছিল—'

'আমি দিনমণি হালদারের কথা বলিনি, হাসির বাপের কথা বলেছি। হাসির জন্মদাতা পিতা।'

নীলমণিবাবু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। দেখিতে লাগিলাম তাঁহার মুখ হইতে পরতে পরতে রক্ত নামিয়া যাইতেছে। অবশেষে তিনি যখন কথা বলিলেন তখন তাঁহার কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য আর নাই, ক্ষীণ স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'জন্মদাতা পিতা—কার কথা বলছেন ?'

ব্যোমকেশ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'কার কথা বলছি আপনি জানেন, নীলমণিবাবু। গল্পটা আমাকে না বললেই ভাল করতেন।'

অতঃপর নীলমণিবাবু কী বলিতেন তাহা আর শোনা হইল না। বীরেনবাবু প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, রান্না তৈরি। আপনারা স্নান করে নিন। নীলমণিদা, আপনিও মধ্যাহ্ন ভোজনটা এখানেই সেরে নিন না ?'

নীলমণিবাবু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'না না, আমি চললাম। অনেক দেরি হয়ে গেল।' বলিয়া তিনি দ্রুত প্রস্থান করিলেন। আমাদের প্রতি দৃক্‌পাত করিলেন না।

আহারাদি সম্পন্ন করিয়া দুইজনে তাকিয়া মাথায় দিয়া লম্বা হইয়াছিলাম। গড়াগড়া চলিতেছিল।

বলিলাম, 'কি করে বুঝলে বল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'নীলমণিবাবুর গল্প শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল হাসির প্রতি তাঁর পক্ষপাত আছে। অথচ তাঁর গল্প অনুযায়ী, হাসিকে জীবিত অবস্থায় তিনি দেখেননি। তার চরিত্র সম্বন্ধে যে সাক্ষী প্রমাণ পাওয়া যায়, তাতে তাকে পতিগতপ্রাণা সতীসাধ্বী মনে করবার কারণ নেই। সে প্রগল্‌ভা ছিল, তার স্বামী তাকে সন্দেহ করত, একজন অজ্ঞাত লোক রাত্রে তার সঙ্গে দেখা করত। তবে তার প্রতি নীলমণিবাবুর পক্ষপাত কেন ?

'হাসির মা অমলাও সীতা-সাবিত্রী ছিল না। অমলার স্বামী দিনমণি হালদার জেলখানার পোষা পাখি হয়ে দাঁড়িয়েছিল ; মাঝে মাঝে ছাড়া পেত, আবার জেলে গিয়ে ঢুকত। দিনমণি হালদার হাসির বাপ নাও হতে পারে।

'বিনোদ সরকারও হাসির বাপ নয়। হাসির মায়ের সঙ্গে যখন তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তখন হাসির বয়স তিন-চার বছর। তবে কে ?

'নীলমণিবাবু গল্প বলবার আগে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, পুলিসের চাকরিতে ঢুকে প্রথম তিনি এই শহরে পোস্টেড হয়েছিলেন। দিনমণি পেশাদার চোর, তাকে ধরতে কিংবা তার ঘর-দোর খানাতল্লাশ করবার জন্যে হয়তো নীলমণিবাবু গিয়েছিলেন। তিনি তখন যুবক, হয়তো দিনমণির কুহকময়ী স্ত্রীর ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলেন ; দিনমণি জেলে যাবার পর গোপনে দু'জনের মেলামেশা হয়েছিল।

'দু-তিন বছর পরে নীলমণিবাবু এ জেলা থেকে বদলি হয়ে গেলেন ; যাবার আগে জেনে গেলেন তাঁর একটি মেয়ে আছে। মেয়ের নাম হাসি। দূরে গিয়েও তিনি হাসি ও হাসির মায়ের খবর রাখতেন। তিনি বিয়ে করেননি, তাই সংসারের বন্ধন হাসিকে ভুলিয়ে দিতে পারেনি। সংসারে হাসিই তাঁর একমাত্র রক্তের বন্ধন।

'কর্মজীবনের শেষের দিকে তিনি আবার এই শহরে ফিরে এলেন। হাসির মা তখন মরে গেছে, হাসির বিয়ে হয়েছে। নীলমণিবাবুর অভ্যাস ছিল তিনি গভীর রাত্রে সাইকেল চড়ে শহর তদারক করতে বেরুতেন। সেই সময় তিনি হাসির সঙ্গে দেখা করতেন, তাকে ছোটখাটো দু'-একখানা গয়না উপহার দিতেন। হাসিকে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন কিনা বলা যায় না। তবে হাসি হয়তো আন্দাজ করেছিল।

'যে-রাত্রে সুরেশ্বর হাসিকে খুন করে সে-রাত্রে নীলমণিবাবু হাসির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। তারপর যা-যা হয়েছিল সবই আমরা নীলমণিবাবুর মুখে শুনেছি। আমার বিশ্বাস সুরেশ্বর তাস খেলতে খেলতে উঠে এসে হাসিকে খুন করেছিল, তারপর ফিরে গিয়ে বন্ধুদের বলেছিল—বৌকে খুন করেছি, এখন তোরা আমাকে বাঁচা। চারজনের মধ্যে অটুট বন্ধুত্ব। তারা পরামর্শ করে স্থির করল, মড়া পুড়িয়ে ফেলা যাক, তারপর রটিয়ে দিলেই হবে, হাসি

কুলত্যাগ করেছে।

'নীলমণিবাবু চার বন্ধুকে থানায় ধরে আনলেন, কিন্তু তাদের অ্যালিবাই ভাঙতে পারলেন না। তিনি যখন দেখলেন তাঁর মেয়ের হত্যাকারীকে ফাঁসিকাঠে লটকাতে পারবেন না তখন ঠিক করলেন নিজেই তাঁকে খুন করবেন। তিনি আর বিলম্ব করলেন না, হাসির মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সুরেশ্বরকে খুন করলেন।

'কিন্তু ভেবে দেখ, আমি যেভাবে গল্পটাকে খাড়া করেছি, তার আগাগোড়াই অনুমান। এই অনুমান কেবল তখনি সত্যে পরিণত হতে পারে যদি নিশ্চয়ভাবে জানা যায় যে, নীলমণিবাবু হাসির বাপ। আমি তাঁর জন্যে ফাঁদ পাতলাম, আচমকা জিগ্যেস করলাম—হাসির মায়ের নাম কি? তিনি না ভেবেচিন্তে বলে ফেললেন—অমলা!

'হাসির মায়ের নাম তিনি জানলেন কি করে? দশ বছর আগে সে মরে গেছে, এই মামলায় তার নাম একবারও কেউ উচ্চারণ করেনি। তবে নীলমণিবাবু জানলেন কি করে? আর সন্দেহ রইল না।

'আমার সামনেই হাসির মায়ের নাম উচ্চারণ করেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, অসাবধানে তিনি ফাঁদে পা দিয়েছেন, আমিও তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিলাম আমার ফাঁদ পাতা ব্যর্থ হয়নি। নীলমণিবাবুর অজানা আসামী স্বয়ং নীলমণিবাবু।'

ব্যোমকেশের যুক্তিজালে ছিদ্র পাইলাম না। বলিলাম, 'নীলমণিবাবু তাহলে নিরস্ত্র যুদ্ধের কায়দা আগে থাকতে জানতেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না। বিদ্যেটা তিনি সিভিল সার্জন মেজর বর্মণের কথা শুনে শিখে নিয়েছিলেন।'